ইউনিট ৪
রূপতত্ত্ব

পাঠ ৪.১ : বাংলা শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা শব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারবেন।
- শব্দের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শব্দের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

ভাষা হিসেবে বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে এর শব্দ-ভান্ডার। বিভিন্ন ভাষার শব্দ গ্রহণে এবং আত্মীকরণে বাংলা ভাষা অত্যন্ত উদার। তবে, এই ঔদার্য মূলত শব্দ-ভাণ্ডার পর্যায়েই সীমিত। ভাষার সবচেয়ে ব্যবহারিক যে স্তর বাক্য, তাতে বাংলা ভাষা সবসময় নিজস্ব বিন্যাসরীতিই অনুসরণের পক্ষপাতী। অপরদিকে, ধ্বনির ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, অন্য ভাষার অনেক ধ্বনি উচ্চারণের সামর্থ্য বাংলা ভাষীদের থাকলেও নিজস্ব ধ্বনি-ব্যবস্থার প্রতিই তারা আস্থাশীল। কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে বিষয়টি মোটেই এরূপ নয়। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কারণে বিবিধ ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। এ কারণে বাংলা ভাষার শব্দকে উৎপত্তিগত দিক দিয়ে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো : তৎসম, অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ। এদের মধ্যে অর্ধ-তৎসম, তদ্ভব ও দেশি বলতে যেসব শব্দকে বোঝায় সেসব শব্দকে 'খাঁটি বাংলা' শব্দ নামেও অভিহিত করা হয়। বস্তুত, এগুলোকে বলা যেতে পারে বাংলা শব্দের উৎস অনুসারে শ্রেণিবিভাগ। আবার শব্দের গঠনকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলা ভাষার শব্দকে মৌলিক ও সাধিত — এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। এছাড়া বাগর্থমূলক বিবেচনায় বাংলা শব্দকে যৌগিক শব্দ, রূঢ়ি শব্দ এবং যোগরূঢ় শব্দ — এই তিন ভাগে ভাগ করার রীতি চালু রয়েছে। তাহলে বলা যায় যে, বাংলা ভাষার শব্দকে মূলত তিনটি বিবেচনা অনুসারে শ্রেণিবিভক্ত করা যায়। এগুলো হলো :

ক. উৎস অনুসারে শ্রেণিবিভাগ;
খ. গঠন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ;
গ. বাগর্থ অনুসারে শ্রেণিবিভাগ।

নিচে এদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

ক. উৎস অনুসারে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ

১. তৎসম শব্দ : বাংলা ভাষায় প্রচুর শব্দ রয়েছে যেগুলো সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে। এদের মধ্যে কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলো কোনো প্রকার পরিবর্তন ছাড়াই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের বৈয়াকরণগণ 'তৎসম' বা তার (সংস্কৃতের) সমান হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রায় সকল বৈয়াকরণই সংস্কৃতের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল ছিলেন। তাই হিন্দি কিংবা গুজরাটি থেকে আসা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃতকে একই কাতারে রাখা যায়নি, যদিও এই তিনটি ভাষাই ইন্দো-ইরানীয় ভাষা-শাখারই অন্তর্গত। দীর্ঘদিন এরূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল যে, বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার 'কন্যা'সমান। আর সেই কারণেই সংস্কৃতের এমন প্রাধান্য বৈয়াকরণদের মাঝে রয়ে গেছে। তৎসম শব্দের কয়েকটি উদাহরণ হলো : চন্দ্র, নক্ষত্র, ভবন, প্রত্যাশা, পরীক্ষা, মনুষ্য প্রভৃতি।

২. অর্ধ-তৎসম শব্দ: সংস্কৃতকে মানদণ্ড ধরে নিয়েই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যে, সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত যেসব শব্দ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলো অর্ধ-তৎসম শব্দ। এই শব্দগুলো মানুষের মুখে মুখেই পাল্টেছে এবং এর থেকে এমন ধারণা করাও অসংগত হবে না যে, সাধারণ বাংলা ভাষী জনগণের আসলে সংস্কৃতকে অতিরিক্ত

গুরুত্ব প্রদানের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাই তারা তাদের মতো করে সংস্কৃত অনেক শব্দকে সহজ করে নিয়েছে। অর্ধ তৎসম শব্দের কয়েকটি উদাহরণ হলো : জ্যোৎস্না> জোছনা, শ্রাদ্ধ> ছেরাদ্দ, গৃহিণী> গিন্নী, বৈষ্ণব> বোষ্টম, কুৎসিত> কুচ্ছিত প্রভৃতি।

৩. তদ্ভব শব্দ: প্রাকৃত তথা অপভ্রংশ স্তর অতিক্রম করে যেসব সংস্কৃত শব্দ পরিবর্তিতরূপে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকেই বলা হয় তদ্ভব শব্দ। অর্থাৎ, তদ্ভব শব্দের মূল অবশ্যই সংস্কৃত কিন্তু বাংলা ভাষায় তাদের পরিবর্তিত রূপ ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ, এসব শব্দ সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে প্রাকৃত এবং তৎ-পরবর্তী স্তর অপভ্রংশে ব্যবহৃত হতো, পরে আবার সেগুলো আরও পরিবর্তিত হয়ে তদ্ভব শব্দ হিসেবে বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তদ্ভব শব্দের কয়েকটি উদাহরণ হলো: মস্তক > মত্থ > মাথা, চর্মকার> চম্মআর> চামার, হস্ত> হত্থ > হাত ইত্যাদি।

৪. দেশি শব্দ: বাংলা অঞ্চলে অতি প্রাচীন কাল থেকে বাঙালিদের পাশাপাশি অন্যভাষী নৃগোষ্ঠীর বাস ছিল। এদের কেউ কেউ আবার বাঙালি জাতির উদ্ভবের আগে থেকেই এই ভূখণ্ডে বাস করত বলে নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে। এসব নৃগোষ্ঠীর ভাষা থেকে যে সব শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সে সব শব্দকে বলা হয় দেশি শব্দ। বিশেষ করে কোল, মুণ্ডা, ভীলসহ প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর ভাষার শব্দ দেশি শব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কুড়ি (বিশ), পেট (উদর), চুলা (উনুন) প্রভৃতি।

৫. বিদেশি শব্দ: সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তনের সূত্র ধরে বিভিন্ন সময়ে বাংলাভাষীরা অন্য ভাষা এবং সেই ভাষার মানুষের সংস্পর্শে এসেছে। সেই সূত্রে, সেসব ভাষার অনেক শব্দ কখনও অবিকৃতভাবে, কখনও পরিবর্তিত রূপে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে গৃহীত হয়েছে। এ ধরনের শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। এ ধরনের শব্দের কিছু উদাহরণ হলো:

আরবি শব্দ : আল্লাহ, ইমান, কোরবানি, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, হাদিস, হালাল, আদালত, ইদ, উকিল, ওজর, কানুন, কলম, কেচ্ছা, খারিজ, নগদ, বাকি, মহকুমা, মোক্তার, রায় প্রভৃতি।

ফারসি শব্দ: গুনাহ, দোজখ, নামাজ, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা, কারখানা, চশমা, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, মেথর, রসদ, আমদানি, জানোয়ার, নমুনা, রফতানি, প্রভৃতি।

ইংরেজি শব্দ: চেয়ার, টেবিল, ইস্কুল (school), বাক্স (box), হাসপাতাল (hospital), বোতল (bottle) প্রভৃতি।

পর্তুগিজ শব্দ : আনারস, আলপিন, আলমারি, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, বালতি প্রভৃতি।

ফরাসি শব্দ : কুপন , ডিপো, রেস্তোরাঁ প্রভৃতি।

ওলন্দাজ শব্দ : ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ প্রভৃতি।

গুজরাটি শব্দ : খদ্দর, হরতাল প্রভৃতি।

পাঞ্জাবি শব্দ : চাহিদা, শিখ প্রভৃতি।

তুর্কি শব্দ : চাকর, চাকু, দারোগা প্রভৃতি।

চিনা শব্দ : চা, চিনি, লিচু প্রভৃতি।

মায়ানমার/ বর্মি শব্দ : ফুঙ্গি, লুঙ্গি প্রভৃতি।

জাপানি শব্দ : রিকশা, হারিকিরি প্রভৃতি।

খ. গঠন অনুসারে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ

গঠন অনুসারে বাংলা শব্দকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো:

১. মৌলিক শব্দ : যে সব শব্দকে অর্থসঙ্গতিপূর্ণভাবে বিভাজন করা সম্ভব নয় তাকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমন : গোলাপ, নাক, লাল, তিন, ইত্যাদি। এই শব্দগুলোকে আরও ছোট অংশে বিভাজনের চেষ্টা করা হলে দেখা যায় যে, কোনো অর্থদ্যোতক কিংবা অর্থবাচক অংশ পাওয়া যায় না। উদাহরণের অন্তর্গত 'গোলাপ' শব্দটি হয়ত 'গো' এবং 'লাপ' এই দুটি অংশে ভাগ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, 'গো' অংশটি অর্থপূর্ণ হলেও এর সঙ্গে গোলাপের কোনো

সম্পর্ক নেই, আর লাপ বাংলা ভাষার কোনো শব্দই নয়। ফলে, গোলাপ শব্দটিকে আর কোনো ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় না। এই শব্দগুলোই মৌলিক শব্দ।

২. সাধিত শব্দ : যে সব শব্দকে বিভাজন করলে এক বা একাধিক অর্থদ্যোতক কিংবা অর্থবাচক অংশ পাওয়া যায় সেসব শব্দকে সাধিত শব্দ বলে। মূলত, মৌলিক শব্দ থেকেই ব্যাকরণিক বিধি অনুসরণ করে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সাহায্যে, উপসর্গ যোগে কিংবা সমাসের মাধ্যমে সাধিত শব্দ গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ : চাঁদমুখ, মশারি, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।

গ. বাগর্থ অনুসারে বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ

১. যৌগিক শব্দ: প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যেমন থাকে তেমনি এর ব্যবহারিক অর্থও থাকে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, একটি শব্দের উৎপত্তি যখন ঘটেছিল তখন তার যে অর্থ ছিল তা-ই হলো ওই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ; আর শব্দটি বর্তমানে কোন অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে তা-ই তার ব্যবহারিক অর্থ। যৌগিক শব্দের ক্ষেত্রে এই দুটি অর্থই অভিন্ন থাকবে। অর্থাৎ, শব্দগঠনের প্রক্রিয়ায় যেসব শব্দের ব্যবহারিক অর্থ তাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থকেই অনুসরণ করে তাদের যৌগিক শব্দ বলে। যেমন, 'জীবনী' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'জীব+ অন+ ঈ' অর্থাৎ 'জীব' শব্দ হতে। তাই 'জীবনী' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হওয়া উচিত জীব সংশ্লিষ্ট কোনো অর্থ। আর 'জীবনী' শব্দের অর্থ 'জীবের বেঁচে থাকার বিবরণ'। অর্থাৎ, 'জীবন' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বজায় থেকেছে। কয়েকটি যৌগিক শব্দের উদাহরণ হলো : -

মূল শব্দ	শব্দ গঠন (অর্থ)	অর্থ
গায়ক	গৈ+অক	যে গান করে
কর্তব্য	কৃ+তব্য	যা করা উচিত
বাবুয়ানা	বাবু+আনা	বাবুর ভাব
মধুর	মধু+র	মধুর মত মিষ্টি গুণযুক্ত

২. রূঢ়ি শব্দ: ব্যুৎপত্তিগত এবং ব্যবহারিক অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এমন প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দকে রূঢ়ি শব্দ বলে। রূঢ়ি শব্দের কয়েকটি উদাহরণ হলো :

মূল শব্দ	শব্দ গঠন	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	ব্যবহারিক অর্থ
হস্তী	হস্ত+ইন	হাত আছে যার	একটি বিশেষ প্রাণী, হাতি
গবেষণা	গো+এষণা	গরু খোঁজা	ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা
বাঁশি	বাঁশ+ইন	বাঁশি দিয়ে তৈরি	বাঁশের তৈরি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র
প্রভাত	প্র+ভাত	প্রকৃষ্টভাবে আলোকিত	সকাল বেলা

লক্ষণীয় যে, ওপরের উদাহরণের প্রতিটি শব্দই হয় প্রত্যয়নিষ্পন্ন অথবা উপসর্গ যোগে গঠিত। এবং প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ পৃথক। তাই এরা রূঢ়ি শব্দ হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে।

৩. যোগরূঢ় শব্দ : সমাসনিষ্পন্ন শব্দ যদি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে ভিন্ন কোনো ব্যবহারিক অর্থ ধারণ করে তবে তাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। নিচের কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ করা যেতে পারে :

মূল শব্দ	শব্দ গঠন	ব্যবহারিক অর্থ
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	পদ্মফুল
রাজপুত	রাজার পুত্র	একটি জাতি বিশেষ, ভারতের একটি জাতি
মহাযাত্রা	মহাসমারোহে যাত্রা	মৃত্যু

শব্দ ও রূপমূল

শব্দকে বিভাজন করলে আরো ক্ষুদ্রতর বাগর্থদ্যোতক অংশ পাওয়া যায়। ভাষার এই সব বাগর্থদ্যোতক ক্ষুদ্রতম একককে বলা হয় রূপমূল। অর্থাৎ, রূপমূল হলো ভাষার এমন ক্ষুদ্রতম উপাদান যাদের হয় সুস্পষ্ট বাগর্থ থাকবে কিংবা অন্ততপক্ষে বাগর্থের কোনো যৌক্তিক ইঙ্গিত থাকবে। আমরা জানি ভাষার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম উপাদান হচ্ছে ধ্বনিমূল। কিন্তু ধ্বনিমূলগুলো কোনো অর্থদ্যোতকতাকে ধারণ করে না। অপরদিকে, রূপমূল মাত্রই কোনো না কোনোভাবে অর্থসংশ্লিষ্ট হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'অবোধ' শব্দটিকে দুটি ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায় : 'অ' এবং 'বোধ'। এখানে 'অ'

একটি রূপমূল যা উপসর্গ হিসেবে এই শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে এবং 'বোধ' আরেকটি রূপমূল। লক্ষণীয় যে, 'অ' রূপমূলটির স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশের সুযোগ না থাকলেও এর সাহায্যে কোনো প্রকার অভাবকে বোঝানো হচ্ছে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। অপরদিকে, 'বোধ' রূপমূলটি স্বাধীনভাবেই অর্থ প্রকাশ করতে পারছে। এর ওপর ভিত্তি করে রূপমূলকে দুটি ভাগে ভাগ ভাগ করা যায়। এগুলো হলো :

মুক্ত রূপমূল
বদ্ধ রূপমূল

মুক্তরূপমূলগুলো মুক্ত তথা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এদেরকে আর বিভাজন করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, মৌলিক শব্দ হিসেবে নির্দেশিত প্রত্যেকেই মুক্তরূপমূল হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। অপরদিকে বদ্ধরূপমূলগুলোর কোনো স্বাধীন প্রকাশ সম্ভব নয়। বিভিন্ন উপসর্গ, প্রত্যয় প্রভৃতি বদ্ধরূপমূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি শব্দের রূপমূল বিভাজন দেখানো যেতে পারে :

প্রদত্ত শব্দ	**গঠন**	**মুক্তরূপমূল**	**বদ্ধরূপমূল**
সম্প্রীতি	সম্+ প্রীত্+ ই	প্রীত্	সম্, ই
পরিবর্তনশীলতা	পরি+ বর্তন (বৃত্+ অনট্)+ শীল+ তা	বর্তন	পরি, শীল, তা

শব্দ ও গঠনবৈচিত্র্য

বাংলা শব্দের গঠন বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মূলত তিনভাবে বাংলা শব্দ গঠিত হতে পারে। এগুলো হলো : উপসর্গ যোগে, প্রত্যয় যোগে এবং যৌগিকীকরণ তথা সমাসের মাধ্যমে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সন্ধির সাহায্যে শব্দ গঠনের প্রচলিত ধারণা যথাযথ নয়। সন্ধি মূলত একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যা শব্দস্তরে প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ, একটি শব্দ গঠনের পর যদি দেখা যায় যে, ওই শব্দে এমন কতগুলো ধ্বনি পাশাপাশি বসেছে যাদের এক ধ্বনিতে পরিণত করা সম্ভব তাহলে সেখানে সন্ধি ঘটতে পারে। কিন্তু এটি যে বাধ্যতামূলক কোনো বিষয়, তা কিন্তু নয়। দুটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। আমরা জানি, 'সিংহাসন' শব্দটি গঠিত হয়েছে 'সিংহ চিহ্নিত আসন' থেকে। অর্থাৎ, এই সমাসের পূর্বপদ সিংহ এবং পরপদ আসন পাশাপাশি বসেছে। এখন লক্ষ করা গেল যে, সিংহ-এর শেষে একটি স্বরধ্বনি রয়েছে এবং আসন-এর শুরুতে একটি স্বরধ্বনি রয়েছে। তাই এই দুটি স্বরধ্বনি এক ধ্বনিতে পরিণত হয়ে সিংহাসন শব্দটি গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ, শব্দ গঠনের মূল অংশে সন্ধির কোনো ভূমিকা ছিল না। আবার বাংলা ভাষায় প্রচলিত অভিন্নার্থক দুটি শব্দ — উপরিউক্ত এবং উপর্যুক্ত। দুটি শব্দই ব্যাকরণসম্মত এবং প্রথমটিতে সন্ধি ঘটেনি এবং দ্বিতীয়টিতে সন্ধি ঘটেছে। তাতে শব্দটির গঠনগত কোনো ত্রুটি তৈরি হয়নি। সুতরাং বাংলা শব্দ গঠনে উপসর্গ, প্রত্যয় এবং সমাসই ভূমিকা পালন করে।

উপসর্গ এবং উপসর্গ যোগে শব্দ গঠন

উপসর্গ : বাংলা ভাষায় কিছু বদ্ধরূপমূল তথা শব্দাংশ রয়েছে যারা ধাতু বা প্রাতিপদিকের পূর্বে বসে এবং শব্দের অর্থের পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা সংকোচন সাধন করতে পারে। এদের উপসর্গ বলা হয়। এদের অর্থবাচকতা না থাকলেও অর্থদ্যোতকতা রয়েছে। অর্থাৎ, এরা নিজেরা স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম না হলেও অন্য কোনো ভাষিক উপাদানের সঙ্গে বসে এরা অর্থের নানাবিধ রূপান্তর ঘটাতে পারে। শব্দের শুরুতে যোগ হয়ে এটি নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে, অর্থের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারে, অর্থের সংকোচন ঘটাতে পারে এবং কখনও কখনও পুরো অর্থটিই পাল্টে দিতে পারে। যেমন, 'অপ' একটি উপসর্গ, যা স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত না হলেও সাধারণত কোনো ক্ষতিকারক কিছুর দ্যোতনা তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, এটি যখন 'কার'-এর আগে বসে তখন অর্থের সংকোচন ঘটিয়ে নতুন শব্দ 'অপকার' তৈরি করে। আবার এটি যখন 'রূপ' এর আগে বসছে তখন একদিকে 'অপ' অংশটির সাধারণ যে অর্থদ্যোতনা তা পাল্টে গিয়ে 'অপরূপ' শব্দ তৈরির মধ্য দিয়ে 'রূপ' শব্দটির অর্থের প্রসারণ ঘটাচ্ছে। অপর একটি উপসর্গ 'অ' বিভিন্ন শব্দ যেমন 'ভাব' এর আগে বসে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট 'অভাব' তৈরি করছে। অর্থাৎ, এখানে উপসর্গ শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। উৎস অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উপসর্গ মূলত তিন প্রকার : বাংলা উপসর্গ, সংস্কৃত উপসর্গ এবং বিদেশি উপসর্গ।

বাংলা উপসর্গ : বাংলা ভাষায় বাংলা উপসর্গ মোট **২১** টি। এগুলো হলো :

অ	অঘা	অজ	অনা	
আ	আড়	আন	আব	
ইতি	উন (উনা)	কদ	কু	
নি	পাতি	বি	ভর	রাম
স	সা	সু	হা	

বাংলা উপসর্গগুলোর প্রয়োগ নিচে উপস্থাপিত হলো :

উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ/ প্রয়োগ
অ	নিন্দিত	অকেজো (নিন্দিত কাজ করে যে), অপয়া
	অভাব	অচিন (চিন-পরিচয়ের অভাব), অজানা
	ক্রমাগত	অঝোর (ক্রমাগতভাবে ঝরতে থাকা), অঝোরে
অঘা	বোকা	অঘারাম, অঘাচণ্ডী
অজ	নিতান্ত/ মন্দ	অজপাড়াগাঁ (একেবারে নিতান্তই পাড়াগাঁ), অজমূর্খ
অনা	অভাব	অনাবৃষ্টি (বৃষ্টির অভাব)
	ছাড়া	অনাছিষ্টি (সৃষ্টিছাড়া)
	অশুভ	অনামুখো (অশুভ, মুখ যার অশুভ)
আ	অভাব	আলুনি (লবণের অভাব), আকাঁড়া
	বাজে, নিকৃষ্ট	আগাছা
আড়	বক্র/ বাঁকা	আড়চোখে (বাঁকা চোখে)
	আধা, প্রায়	আড়পাগলা (আধা পাগলা), আড়মোড়া
	বিশিষ্ট	আড়গড়া (আস্তাবল), আড়কাঠি
আন	না	আনকোরা (যা এখনো কোরা হয়নি, একদম নতুন)
	বিক্ষিপ্ত	আনমনা (মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা)
আব	অস্পষ্টতা	আবছায়া (অস্পষ্ট ছায়া)
ইতি	পুরনো	ইতিকথা (বহু পুরনো কথা)
উন (উনা)	কম	উনিশ (বিশ হতে ১ উন)
কদ্	নিন্দিত	কদাকার (নিন্দিত/ কুৎসিত আকার), কদর্য
কু	কুৎসিত/ অপকর্ষ	কু-অভ্যাস (কুৎসিত/ খারাপ অভ্যাস), কুকথা
নি	নাই/ নেতি	নিখুঁত (খুঁত নেই যার), নিরেট
পাতি	ক্ষুদ্র	পাতিহাঁস (ক্ষুদ্র প্রজাতির হাঁস), পাতকুয়ো
বি	ভিন্নতা	বিপথ (ভিন্ন পথ), বিভূঁই
ভর	পূর্ণতা	ভরপেট (পেটের ভর্তিপূর্ণ অবস্থা), ভরদুপুর
রাম	বড়/ উৎকৃষ্ট	রামছাগল (বড় বা উৎকৃষ্ট প্রজাতির ছাগল), রামদা
স	সঙ্গে	সলাজ (লাজের সঙ্গে), সরব
সা	উৎকৃষ্ট	সাজিরা (উৎকৃষ্ট মানের এক প্রকার জিরা)
সু	উত্তম	সুদিন (উত্তম দিন), সুখবর
হা	অভাব	হাভাতে (ভাতের অভাব)

সংস্কৃত উপসর্গ : সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত বিশটি উপসর্গ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এগুলো সাধারণত সংস্কৃত উৎসের শব্দের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো হলো :

প্র	পরা	অপ	সম
নি	অনু	অব	নির
দুর	বি	অধি	সু

উৎ পরি প্রতি অতি
অপি অভি উপ আ

নিচে সংস্কৃত উপসর্গগুলোর প্রয়োগ দেখানো হলো-

উপসর্গ	অর্থ	উদাহরণ/ প্রয়োগ
প্র	প্রকৃষ্ট/ সম্যক	প্রচলন (প্রকৃষ্ট রূপ চলন/ চলিত যা) প্রভাব
	খ্যাতি	প্রসিদ্ধ
	আধিক্য	প্রবল (বলের আধিক্য)
	গতি	প্রবেশ
	ধারা-পরম্পরা	প্রপৌত্র
পরা	আতিশয্য	পরাক্রান্ত
	বিপরীত	পরাজয়
অপ	বিপরীত	অপমান, অপচয়
	নিকৃষ্ট	অপসংস্কৃতি (নিকৃষ্ট সংস্কৃতি)
	স্থানান্তর	অপসারণ
	বিকৃত	অপমৃত্যু
	সুন্দর	অপরূপ
সম	সম্যক রূপে	সম্পূর্ণ
	সম্মুখে	সমাগত, সম্মুখ
নি	নিষেধ	নিবারণ
	নিশ্চয়	নির্ণয়
	আতিশয্য	নিদারুণ
	অভাব	নিষ্কলুষ (কলুষতাহীন)
অনু	পশ্চাৎ	অনুগামী, অনুজ,
	সাদৃশ্য	অনুরূপ, অনুকার
	পৌনঃপুন্য	অনুশীলন (বারবার করা)
	সঙ্গে	অনুকূল
অব	হীনতা	অবজ্ঞা, অবমাননা
	সম্যকভাবে	অবরোধ, অবগাহন
	নিম্নমুখী	অবতরণ
	অল্পতা	অবশেষ, অবসান, অবেলা
নির	অভাব	নিরক্ষর, নির্জীব
	নিশ্চয়	নির্ধারণ, নির্ভর
	বাহির/ বহির্মুখিতা	নির্গত, নিঃসরণ
দুর	মন্দ	দুর্দশা, দুর্নাম
	কষ্টসাধ্য	দুর্লভ, দুরতিক্রম্য
অধি	আধিপত্য	অধিপতি, অধিবাসী
	উপরি	অধিরোহণ, অধিষ্ঠান
	ব্যাপ্তি	অধিবাস, অধিগত
বি	বিশেষ রূপে	বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান
	অভাব	বিনিদ্র, বিবর্ণ
	গতি	বিচরণ, বিক্ষেপ

	অপ্রকৃতিস্থ	বিকার, বিপর্যয়
সু	উত্তম	সুকণ্ঠ, সুপ্রিয়
	সহজ	সুগম, সুলভ
	আতিশয্য	সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ
উৎ	ঊর্ধ্বমুখিতা	উন্নতি, উত্তোলন
	আতিশয্য	উত্তপ্ত, উৎফুল্ল
	প্রস্তুতি	উৎপাদন, উচ্চারণ
	অপকর্ষ	উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল
পরি	বিশেষ রূপ	পরিপক্ব, পরিপূর্ণ
	শেষ	পরিশেষ
	সম্যক রূপে	পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা
	চতুর্দিক	পরিক্রমণ, পরিমণ্ডল
প্রতি	সদৃশ	প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি
	বিরোধ	প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী
	পৌনঃপুন্য	প্রতিদিন, প্রতিমাস
	অনুরূপ কাজ	প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যুপকার
অতি	আতিশয্য	অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়
	অতিক্রম	অতিমানব, অতিপ্রাকৃত
অপি	অপিচ	অপিনিহিতি
অভি	সম্যক	অভিজ্ঞ, অভিভূত
	গমন	অভিযান, অভিসার
	সম্মুখ বা দিক	অভিমুখ, অভিবাদন
উপ	সামীপ্য	উপকূল, উপকণ্ঠ
	সদৃশ	উপদ্বীপ, উপবন
	ক্ষুদ্র	উপগ্রহ, উপসাগর
	বিশেষ	উপনয়ন (পৈতা), উপভোগ
আ	পর্যন্ত	আকণ্ঠ, আমরণ
	ঈষৎ	আরক্ত, আভাস
	বিপরীত	আদান, আগমন

বিদেশি উপসর্গ : বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে আগত উপসর্গসমূহ এই শ্রেণির অন্তর্গত। এদের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। কেননা, প্রতিনয়তই নতুন নতুন শব্দ অন্য ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় আসার সুযোগ বিদ্যমান। আর সেই ভাষার শব্দের সূত্রে বিভিন্ন উপসর্গও বাংলা ভাষার শব্দ-ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিদেশি উপসর্গের তালিকা উদাহরণসহ উপস্থাপিত হলো :

ফারসি উপসর্গ

উপসর্গ	**অর্থ**	**উদাহরণ/ প্রয়োগ**
কার	কাজ	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার, কারদানি
দর	মধ্যস্থ, অধীন	দরপত্তনি, দরপাট্টা, দরদালান
না	না	নাচার, নারাজ, নাখোশ
নিম	আধা	নিমরাজি
ফি	প্রতি	ফি-রোজ, ফি-বছর
বদ	মন্দ	বদমেজাজ, বদহজম, বদনাম

বে	না	বেআদব, বেতার, বেকার
বর	বাইরে, মধ্যে	বরদাস্ত, বরখেলাপ
ব	সহিত	বকলম
কম	স্বল্প	কমজোর, কমবখত

আরবি উপসর্গ

উপসর্গ	**অর্থ**	**উদাহরণ/ প্রয়োগ**
আম	সাধারণ	আমদরবার, আমমোক্তার
খাস	বিশেষ	খাসমহল, খাসকামরা
লা	না	লাজওয়াব, লাপাত্তা
গর	অভাব	গরমিল, গররাজি

ইংরেজি উপসর্গ

উপসর্গ	**অর্থ**	**উদাহরণ/ প্রয়োগ**
ফুল	পূর্ণ	ফুলহাতা, ফুলবাবু
হাফ	আধা	হাফহাতা, হাফপ্যান্ট
হেড	প্রধান	হেডমাস্টার, হেডমৌলভি
সাব	অধীন	সাব-অফিস, সাব-ইন্সপেক্টর

হিন্দি উপসর্গ

উপসর্গ	**অর্থ**	**উদাহরণ/ প্রয়োগ**
হর	প্রত্যেক	হরকিসিম, হরহামেশা, হরেক

প্রত্যয় ও প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠন

বাংলা ভাষায় ধাতু কিংবা প্রাতিপদিকের পরে বিভিন্ন বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়। এই বদ্ধরূপমূলগুলোকে প্রত্যয় নামে অভিহিত করা হয়। গঠন অনুসারে দুই রকমের প্রত্যয় বাংলা ভাষায় রয়েছে। এগুলো হলো : কৃৎ প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয়। কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয় ধাতুর সঙ্গে এবং তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত হয় প্রাতিপদিকের সঙ্গে। উল্লেখ্য যে, ক্রিয়াশব্দের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল বা ক্রিয়াপ্রকৃতি। অপরদিকে, বিভক্তিবিহীন নামশব্দকে বলা হয় প্রাতিপদিক বা নামপ্রকৃতি। অর্থাৎ, ক্রিয়া কিংবা নামশব্দের মূল অংশকে সাধারণভাবে প্রকৃতি বলা হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই সকল মূল অংশের সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার শর্তেই এদের প্রকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য রয়েছে এমন প্রকৃতি তথা ধাতু এবং প্রাতিপদিক উভয়ই অবিভাজ্য রূপমূল হয় এবং এদের সঙ্গে নির্দিষ্ট প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মুক্তরূপমূল 'শোন' একটি ধাতু এবং এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে বদ্ধরূপমূল তথা প্রত্যয় 'আ'। এর ফলে, নতুন শব্দ গঠিত হবে 'শোনা'। আবার মুক্তরূপমূল 'ঘর' একটি প্রাতিপদিক এবং এর সঙ্গে 'আমি' প্রত্যয় তথা বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে তৈরি হতে পারে নতুন শব্দ 'ঘরামি'। এভাবে প্রকৃতি এবং প্রত্যয় যোগে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠিত হয়। বাংলা ব্যাকরণে ধাতু চিহ্নিত করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যাকরণিক চিহ্ন (√) ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ √বল্ মানে 'বল্' ধাতু।

অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় প্রকৃতি দুই প্রকার : নামপ্রকৃতি ও ক্রিয়াপ্রকৃতি। নামপ্রকৃতির কয়েকটি উদাহরণ হলো : লাজ, বড়, ঘর প্রভৃতি। অপরদিকে, ক্রিয়াপ্রকৃতির কয়েকটি উদাহরণ হলো– √পড়্, √নাচ্, √জিত্ প্রভৃতি। একইভাবে, গঠন অনুসারে বাংলা ভাষায় প্রত্যয় দুই প্রকার : কৃৎ প্রত্যয় এবং তদ্ধিত প্রত্যয়। কৃৎ প্রত্যয়ের কয়েকটি উদাহরণ হলো : -উক, -আই, -আমি এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ের কয়েকটি উদাহরণ হলো : -উয়া, -উনে এবং -আ।

কৃদন্ত শব্দ: কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় কৃদন্ত শব্দ। অর্থাৎ ক্রিয়া প্রকৃতি এবং কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে বলা হয় কৃদন্ত শব্দ। ওপরের উদাহরণে ব্যবহৃত ক্রিয়া প্রকৃতি এবং কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত কৃদন্ত শব্দগুলো হলো যথাক্রমে : পড়ুয়া, নাচুনে, জিতা।

তদ্ধিতান্ত শব্দ: তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দকে বলা হয় তদ্ধিতান্ত শব্দ। ওপরের উদাহরণে ব্যবহৃত নাম প্রকৃতি এবং তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত তদ্ধিতান্ত শব্দগুলো হলো: ওপরের লাজুক, বড়াই, ঘরামি।

প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের গুণ ও বৃদ্ধি : প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের ধারণা রূপতত্ত্বের বিষয় হলেও কখনও কখনও তা শব্দ গঠনে ধ্বনিতত্ত্বকে সংশ্লিষ্ট করে। মূলত, সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত শব্দের ক্ষেত্রেই এরূপ দেখা যায়। কখনও কখনও লক্ষ করা যায় যে, নির্দিষ্ট কিছু প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি অংশের আদিস্বরের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মদ্বয়কেই যথাক্রমে গুণ ও বৃদ্ধি নামে অভিহিত করা হয়। নিচে গুণ ও বৃদ্ধি ঘটার সূত্র উল্লেখ করা হলো :

গুণ

ই/ঈ-স্থলে এ	√চিন্+আ= চেনা, √নী+আ= নেওয়া
উ/ঊ-স্থলে ও	√ধু+আ= ধোয়া
ঋ-স্থলে অর	√কৃ+তা = কর্তা > কর্তা >ক্রেতা

বৃদ্ধি

অ-স্থলে আ	√পচ্+ণক(অক) = পাচক
ই/ঈ-স্থলে ঐ	√শিশু+ষ্ণ = শৈশব
উ/ঊ-স্থলে ঔ	√যুব্+অন= যৌবন
ঋ-স্থলে আর	√কৃ+ঘ্যণ(য-ফলা)= কার্য

এছাড়া, সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে কখনও কখনও প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার কালে প্রত্যয়ের অংশবিশেষ লোপ পায়। এই লোপ পাওয়া অংশটিকে 'ইৎ' নামে অভিহিত করা হয়। এছাড়া, প্রকৃতির অন্ত্যধ্বনির আগের ধ্বনিকে 'উপধা' বলা হয়ে থাকে এবং প্রকৃতির আদ্যধ্বনির পরবর্তী সকল ধ্বনিকে 'টি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ, 'ইৎ' প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং 'উপধা' ও 'টি' প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'পাঠক' শব্দটির গঠন হলো : √পঠ্ (প্+অ+ঠ্) + ণক (ণ্+অ+ক্)। এখানে প্রকৃতি অংশের উপধা হলো 'প্+অ', টি হলো 'অ+ক্' এবং চূড়ান্তভাবে শব্দ গঠনের কালে প্রকৃতি অংশে নির্দেশিত 'অ'-এর বৃদ্ধি ঘটে 'আ' হয়েছে। অপরদিকে, প্রত্যয় অংশে 'ণ্'-এর ইৎ ঘটেছে।

কৃৎ প্রত্যয়: উৎস অনুসারে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কৃৎ প্রত্যয়সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো : বাংলা কৃৎ প্রত্যয় ও সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়। নিচে বিভিন্ন ধরনের কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া হলো।

বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

অ √ধর্+অ= ধর
√মার্+অ = মার

অন (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)
√কাঁদ্+অন = কাঁদন
√নাচ্+অন = নাচন
√বাড়্+অন= বাড়ন
√ঝুল্+অন = ঝুলন
√দুল্+অন = দোলন ধাতুর শেষে 'আ-কার' থাকলে 'ওন' হয়। যেমন-

√খা+অন = খাওন

অনা √খেল্+অনা = খেলনা
অনি/উনি √চির্+অনি = চিরনি > চিরুনি
√বাঁধ্+অনি = বাঁধুনি
√আঁট্+অনি = আঁটুনি

অন্ত (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)
√উড়্+অন্ত = উড়ন্ত
√ডুব্+অন্ত = ডুবন্ত

অক √মুড়্+অক = মোড়ক
√ঝল্+অক = ঝলক

আ √পড়্+আ = পড়া
√রাঁধ্+আ = রাঁধা
√কাচ্+আ = কাচা

আই (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)
√চড়্+আই = চড়াই
√সিল্+আই = সিলাই

আও (ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)
√পাকড়্+আও = পাকড়াও
√চড়্+আও = চড়াও

আন (আনো) (প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে বসে)
√জানা+আন = জানানো
√শোনা+আন = শোনানো
√মান+আন = মানান/মানানো

আনি √শুন+আনি = শুনানি
√উড়্+আনি = উড়ানি
(√উড়্+উনি = উড়ুনি)

আরি/রি/উরি
√ডুব্+আরি/উরি = ডুবুরি
√ধুন্+আরি = ধুনারি
√পূজ্+আরি = পূজারি

আল
√মাত্+আল = মাতাল
√মিশ্+আল = মিশাল

ই
√ভাজ্+ই = ভাজি

√বেড়্+ই = বেড়ি

ইয়া/ইয়ে

√মর্+ইয়া = মরিয়া
√নাচ্+ইয়ে = নাচিয়ে
√গা+ইয়ে = গাইয়ে
√লিখ্+ইয়ে = লিখিয়ে

উ

√ডাক্+উ = ডাকু
√ঝাড়্+উ = ঝাড়ু দ্বিত্বপ্রয়োগ : √উড়্+উ = উড়ুউড়ু

উয়া/ও

√পড়্+উয়া = পড়ুয়া
√উড়্+উয়া = উড়ুয়া > উড়ো
√উড়্+ও = উড়ো

তা (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√ফির্+তা = ফিরতা > ফেরতা
√পড়্+তা = পড়তা
√বহ্+তা = বহতা

তি (বিশেষণ গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√ঘাট্+তি = ঘাটতি
√বাড়্+তি = বাড়তি
√কাট্+তি = কাটতি
√উঠ্+তি = উঠতি

না (বিশেষ্য গঠনে ব্যবহৃত হয়)

√কাঁদ্+না = কাঁদনা > কান্না
√রাঁধ্+না = রাঁধনা > রান্না

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

অন (ট্)

√নী+অনট্ > নে+অন = নয়ন
√স্থা+অনট্ = স্থান
√দৃশ+অন্ = দর্শন
√নন্দি+অনট্ = নন্দন

ক্ত

√জ্ঞা+ক্ত = জ্ঞাত
√খ্যা+ক্ত = খ্যাত
√পঠ্+ক্ত = পঠিত
√লিখ্+ক্ত = লিখিত
√বেষ্ট্+ক্ত = বেষ্টিত

কিছু কিছু ধাতুর শেষে 'ই-কার' যুক্ত হয়।

√চল্+ক্ত = চলিত
√লুণ্ঠ্+ক্ত = লুণ্ঠিত
√শিক্ষ্+ক্ত = শিক্ষিত
√মুচ্+ক্ত = মুক্ত
√ভুজ্+ক্ত = ভুক্ত
√গম্+ক্ত = গত
√গ্রন্থ্+ক্ত = গ্রথিত
√ছিদ্+ক্ত = ছিন্ন
√জন্+ক্ত = জাত
√হন্+ক্ত = হত
√মুহ্+ক্ত = মুগ্ধ
√যুধ্+ক্ত = যুদ্ধ
√লভ্+ক্ত = লব্ধ
√বচ্+ক্ত = উক্ত
√বপ্+ক্ত = উপ্ত
√স্বপ্+ক্ত = সুপ্ত
√সৃজ্+ক্ত = সৃষ্ট

ধাতুর শেষে 'চ/জ' থাকলে তা 'ক' হয়। যেমন-

নিপাতনে সিদ্ধ

ক্তি কিছু ধাতুর শেষের ব্যঞ্জন লোপ পায়।
√গম্+ক্তি = গতি
√মন্+ক্তি = মতি
কিছু ধাতুর প্রথম ব্যঞ্জনে আ-কার যুক্ত হয়।
√শম্+ক্তি = শান্তি
√বচ্+ক্তি = উক্তি
√মুচ্+ক্তি = মুক্তি
√ভজ্+ক্তি = ভক্তি
নিপাতনে সিদ্ধ
√বচ্+ক্তি = উক্তি
√গৈ+ক্তি = গীতি
√বুধ্+ক্তি = বুদ্ধি

তব্য
√কৃ+তব্য = কর্তব্য
√দা+তব্য = দাতব্য
√পঠ্+তব্য = পঠিতব্য

অনীয়
√কৃ+অনীয় = করণীয়
√রক্ষ্+অনীয় = রক্ষণীয়
√দৃশ্+অনীয় = দর্শনীয়
√শ্রু+অনীয় = শ্রবণীয়

তৃচ
√দা+তৃচ্ = দাতা

√ক্রী+তৃচ্ = ক্রেতা
√যুধ+তৃচ্ = যোদ্ধা

ণক

√পঠ্+ণক = পাঠক
√নী+ণক > নৈ+অক = নায়ক
√গৈ+ণক = গায়ক
প্রযোজক ধাতুর শেষে 'ই-কার' থাকলে খ্ লোপ পায়।
√লিখ্+ণক = লেখক
√পূঁজি+ণক = পূজক
√স্তাবি+ণক = স্তাবক

ধাতুর শেষে 'আ-কার' থাকলে অতিরিক্ত 'য়' যুক্ত হয়।
বি+√ধা+ণক = বিধায়ক

ঘ্যণ

√কৃ+ঘ্যণ = কার্য্য > কার্য
√বাচ্+ঘ্যণ = বাচ্য
√ভোজ্+ঘ্যণ = ভোজ্য
√যোগ+ঘ্যণ = যোগ্য
পরি+√হার+ঘ্যণ = পরিহার্য

য

√দা+য >√দে+য = দেয়
√হা+য >√হে+য = হেয়
বি+√ধা+য = বিধেয়
অ+√জি+য = অজেয়

√গম্+য = গম্য শেষে ব্যঞ্জন থাকলে য-ফলা হয়।

ণিন

√গ্রহ্+ণিন = গ্রাহী
√পা+ণিন = পায়ী
√দ্রোহ্+ণিন = দ্রোহী
সত্য+√বদ+ণিন = সত্যবাদী
√স্থা+ণিন = স্থায়ী
'হন' ধাতুর ক্ষেত্রে
আত্ম+√হন্+ণিন = আত্মঘাতী

ইন

√শ্রম+ইন = শ্রমী

অল

√জি+অল = জয়
√ক্ষি+অল = ক্ষয়
√বিন্+অল = বিনয়

√হন্+অল = বধ

ইষ্ণু

√চল্+ইষ্ণু = চলিষ্ণু

√ক্ষয়্+ইষ্ণু = ক্ষয়িষ্ণু

বর

√ঈশ্+বর = ঈশ্বর

√নশ্+বর = নশ্বর

র

√হিন্+স+র = হিংস্র

√নম্+র = নম্র

উক/ঊক

√ভু+উক > ভৌ+উক = ভাবুক

√জাগৃ+ঊক = জাগরূক

শানচ

√দীপ্+শানচ্ = দীপ্যমান

√চল্+শানচ্ = চলমান

√বৃধ্+শানচ্ = বর্ধমান

ঘঞ

√বস্+ঘঞ = বাস

√ক্রুধ্+ঘঞ = ক্রোধ

√ভিদ্+ঘঞ = ভেদ

√ত্যজ্+ঘঞ = ত্যাগ

√শুচ্+ঘঞ = শোক

বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়

আ

চোর+আ = চোরা

কেষ্ট+আ = কেষ্টা

ডিঙি+আ = ডিঙা

বাঘ+আ = বাঘা

কাল+আ = কালা,

জল+আ = জলা

রোগ+আ = রোগা

লুন+আ = লুনা > লোনা

আই

বড়+আই = বড়াই

কানু+আই = কানাই

নিম+আই = নিমাই

বোন+আই = বোনাই

মিঠা+আই = মিঠাই

ঢাকা+আই = ঢাকাই

চোর+আই = চোরাই
মোগল+আই = মোগলাই

আমি/আম/
আমো/মি

ইতর+আমি = ইতরামি
পাগল+আমি = পাগলামি
বাঁদর+আমি = বাঁদরামি
ফাজিল+আমো = ফাজলামো
ঠক+আমো = ঠকামো
ঘর+আমি = ঘরামি
ছেলে+মি = ছেলেমি

ই

বাহাদুর+ই = বাহাদুরি
ডাক্তার+ই = ডাক্তারি
মোক্তার+ই = মোক্তারি
পোদ্দার+ই = পোদ্দারি
চাষ+ই = চাষি
জমিদার+ই = জমিদারি
দোকান+ই = দোকানি
রেশম+ই = রেশমি
সরকার+ই = সরকারি

ইয়া > এ

সেকাল+এ = সেকেলে
ভাদর+ইয়া = ভাদরিয়া > ভাদুরে
পাথর+ইয়া = পাথুরিয়া > পাথুরে
মাটি+ইয়া = মেটে
বালি+ইয়া = বেলে
জাল+ইয়া = জালিয়া > জেলে
খুন+ইয়া = খুনিয়া > খুনে
না+ইয়া = নাইয়া > নেয়ে
টনটন+এ = টনটনে
কনকন+এ = কনকনে
চকচক+এ = চকচকে

উয়া > ও

বাত+উয়া = বাতুয়া > বেতো
টাক+উয়া = টাকুয়া > টেকো
ধান+উয়া = ধেনো
মাঠ+উয়া = মেঠো
গাঁ+উয়া = গাঁইয়া > গেঁয়ো
মাছ+উয়া = মাছুয়া > মেছো
তেল+উয়া = তেলো > তেলা

কুঁজ+উয়া = কুঁজো

উ

ঢাল+উ = ঢালু

কল+উ = কলু

উক

লাজ+উক = লাজুক

মিশ+উক = মিশুক

মিথ্যা+উক = মিথ্যুক

আরি/আরু

ভিখ+আরি = ভিখারি

শাঁখ+আরি = শাঁখারি

বোমা+আরু = বোমারু

আলি/আলো/আল>এল

দাঁত+আল = দাঁতাল

লাঠি+আল = লাঠিয়াল > লেঠেল

ধার+আল = ধারাল

শাঁস+আল = শাঁসাল

দুধ+আল = দুধাল > দুধেল

হিম+আল = হিমাল > হিমেল

চতুর+আলি = চতুরালি

ঘটক+আলি = ঘটকালি

সিঁদ+আল>এল = সিঁদেল

উরিয়া>উড়িয়া/উড়ে/রে

হাট+উরিয়া = হাটুরিয়া > হাটুরে

সাপ+উড়িয়া = সাপুড়িয়া > সাপুড়ে

কাঠ+উরিয়া = কাঠুরিয়া > কাঠুরে

উড়

লেজ+উড় = লেজুড়

উয়া/ওয়া>ও

ঘর+ওয়া = ঘরোয়া

জল+উয়া = জলুয়া > জলো

আটিয়া/টে

তামা+আটিয়া = তামাটিয়া > তামাটে

ভাড়া+আটিয়া = ভাড়াটে

রোগা+আটিয়া = রোগাটে

অট>ট

ভরা+ট = ভরাট

জমা+ট = জমাট

লা

মেঘ+লা = মেঘলা

এক+লা = একলা

আধ+লা = আধলা

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

ইত

কুসুম+ইত = কুসুমিত
তরঙ্গ+ইত = তরঙ্গিত
কণ্টক+ইত = কণ্টকিত

ইমন/ইমা

নীল+ইমন = নীলিমা
মহৎ+ইমন = মহিমা

ইল

পঙ্ক+ইল = পঙ্কিল
ফেনা+ইল = ফেনিল

ইষ্ঠ

গুরু+ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ
লঘু+ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ

ইন/ঈ/ইনী

জ্ঞান+ইন = জ্ঞানিন
সুখ+ইন = সুখিন
গুণ+ইন = গুণীন
মান+ইন = মানিন
জ্ঞান+ইন(ঈ)= জ্ঞানী

তা/ত্ব

শত্রু+তা = শত্রুতা
বন্ধু+ত্ব = বন্ধুত্ব
গুরু+ত্ব = গুরুত্ব
ঘন+ত্ব = ঘনত্ব
মহৎ+ত্ব = মহত্ত্ব

তর/তম

মধুর+তর = মধুরতর
প্রিয়+তর = প্রিয়তর
প্রিয়+তম = প্রিয়তম

নীন/ঈন(ন ইৎ)

সর্বজন+নীন = সর্বজনীন
কুল+নীন = কুলীন
নব+নীন = নবীন

নীয়/ঈয়(ন ইৎ)

জল+নীয় = জলীয়
বায়ু+নীয় = বায়বীয়
বর্ষ+নীয় = বর্ষীয়
রাজা+নীয় = রাজকীয়

বতুপ/মতুপ

বান/মান

গুণ+বতুপ = গুণবান
দয়া+বতুপ = দয়াবান
শ্রী+মতুপ = শ্রীমান
বুদ্ধি+মতুপ = বুদ্ধিমান

বিন/বী

মেধা+বিন = মেধাবী
মায়া+বিন = মায়াবী
তেজঃ+বিন = তেজস্বী
যশঃ+বিন = যশস্বী

র

মধু+র = মধুর
মুখ+র = মুখর

ল

শীত+ল = শীতল
বৎস+ল = বৎসল

ষ্ণ(অ)

মনু+ষ্ণ = মানব
যদু+ষ্ণ = যাদব
শিব+ষ্ণ = শৈব
শক্তি+ষ্ণ = শাক্ত
বুদ্ধ+ষ্ণ = বৌদ্ধ
শিশু+ষ্ণ = শৈশব
গুরু+ষ্ণ = গৌরব
কিশোর+ষ্ণ = কৈশোর
পৃথিবী+ষ্ণ = পার্থিব
চিত্র+ষ্ণ = চৈত্র
সূর্য+ষ্ণ = সৌর — নিপাতনে সিদ্ধ। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সুর+ষ্ণ = সৌর।

ষ্ণ্য(য)

মনুঃ+ষ্ণ্য = মনুষ্য
সুন্দর+ষ্ণ্য = সৌন্দর্য
শূর+ষ্ণ্য = শৌর্য
ধীর+ষ্ণ্য = ধৈর্য
পর্বত+ষ্ণ্য = পার্বত্য

ষ্ণি(ই)

রাবণ+ষ্ণি = রাবণি
দশরথ+ষ্ণ্যি = দাশরথি

ষ্ণিক(ইক)

সাহিত্য+ষ্ণিক = সাহিত্যিক
বেদ+ষ্ণিক = বৈদিক
বিজ্ঞান+ষ্ণিক = বৈজ্ঞানিক
নগর+ষ্ণিক = নাগরিক

মাস+ষ্ণিক = মাসিক
ধর্ম+ষ্ণিক = ধার্মিক
সমাজ+ষ্ণিক = সামাজিক
অকস্মাৎ+ষ্ণিক = আকস্মিক

ষ্ণেয় (এয়)
ভগিনী+ষ্ণেয় = ভাগিনেয়
অগ্নি+ষ্ণেয় = আগ্নেয়
বিমাতৃ+ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয়

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

হিন্দি

ওয়ালা>আলা
বাড়ি+ওয়ালা = বাড়িওয়ালা
মাছ+ওয়ালা = মাছওয়ালা
দুধ+ওয়ালা = দুধওয়ালা

ওয়ান>আন
গাড়ি+ওয়ান = গাড়োয়ান
দার+ওয়ান = দারোয়ান

আনা>আনি
মুনশি+আনা = মুনশিআনা/মুন্সিয়ানা
হিন্দু+আনি = হিন্দুআনি/হিন্দয়ানি

পনা
ছেলে+পনা = ছেলেপনা
গিন্নি+পনা = গিন্নিপনা
বেহায়া+পনা = বেহায়াপনা

সা>সে
পানি+সা = পানিসা > পানসে
কাল+সা = কালসা > কালসে

ফারসি

গর>কর
কারি+গর = কারিগর
বাজি+গর = বাজিগর > বাজিকর

দার
খবর+দার = খবরদার
তাঁবে+দার = তাঁবেদার
দেনা+দার = দেনাদার
চৌকি+দার = চৌকিদার
পাহারা+দার = পাহারাদার

বাজ
কলম+বাজ = কলমবাজ
ধোঁকা+বাজ = ধোঁকাবাজ

গলা+বাজ = গলাবাজ

বন্দি/বন্দ

জবান+বন্দি = জবানবন্দি

নজর+বন্দি = নজরবন্দি

সই (মত অর্থে)

মানান+সই = মানানসই

চলন+সই = চলনসই

টেক+সই = টেকসই

সমাস ও সমাসের সাহায্যে শব্দ গঠন

বাংলা ভাষায় সমাস মূলত একধরনের যৌগিকীকরণ। অর্থাৎ, এর সাহায্যে একাধিক শব্দ মিলিত হয়ে যৌগিক শব্দ তৈরি হয়। বলা চলে যে, বাগর্থগত সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের এক শব্দে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো সমাস। এর সাহায্যে ভাষাকে সংহত ও সংক্ষেপিত করা সম্ভব হয়। ভাষার ব্যবহারিক মাধুর্য বৃদ্ধি পায়। সমাসের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু পরিভাষা হলো ব্যাসবাক্য, সমস্তপদ, সমস্যমান পদ, পূর্বপদ এবং পরপদ। নিচে এগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হলো।

ব্যাসবাক্য: সমাসবদ্ধ শব্দের বিস্তারিত রূপই হলো ব্যাসবাক্য। একে বিগ্রহবাক্যও বলা হয়। ব্যাসবাক্যেই মূলত সমাস নির্ণয়ের সূত্রসমূহ নির্দেশিত থাকে।

সমস্ত পদ: ব্যাসবাক্যের সাহায্যে যৌগিকীকরণের মাধ্যমে যে সংহত নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলা হয় সমস্ত পদ।

সমস্যমান পদ: যে উপাদানগুলোর আশ্রয়ে সমস্ত পদ গঠিত হয় তাদের সমস্যমান পদ বলে। এই সমস্যমান পদগুলোই সমাস প্রক্রিয়া সম্পাদন করে।

পূর্বপদ : সমস্ত পদের প্রথম পদকে পূর্বপদ বলে।

পরপদ: সমস্ত পদের শেষ অংশকে পরপদ বলা হয়। একে উত্তরপদ বলেও অভিহিত করা হয়।

নিচের একটি উদাহরণ এই পরিভাষাসমূহের পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম। 'বিদ্যালয়' একটি সমাসবদ্ধ শব্দ। অর্থাৎ, এই সমাসের সমস্তপদটি হলো 'বিদ্যালয়'; আর এর ব্যাসবাক্য হলো : 'বিদ্যার আলয়'। এখানে সমস্যমান পদগুলো হলো : বিদ্যা, আলয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তি 'র'। এই সমাসের পূর্বপদ হলো বিদ্যা এবং পরপদ হলো আলয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাস হলো শব্দগঠনের প্রক্রিয়া। আর তাই একই শব্দ কখনও কখনও একাধিক প্রক্রিয়ায় সমাসনিষ্পন্ন হতে পারে। এ কারণে ব্যাসবাক্য অনুসারেই সমাস নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়। বাংলা ভাষায় প্রধাণত ছয় প্রকারের সমাস রয়েছে। এগুলো হলো : দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব। এছাড়া কিছু অপ্রধান সমাসও রয়েছে। যেমন : প্রাদি, নিত্য, সুপসুপা প্রভৃতি। পূর্বপদ কিংবা পরপদের প্রাধান্যের ওপর ভিত্তি করে সাধারণত সমাস নির্ণয় করা হয়ে থাকে। নিচে এর একটি তালিকা প্রদান করা যেতে পারে :

পূর্বপদের প্রাধান্য	পরপদের প্রাধান্য	সমাসের নাম	
আছে	আছে	দ্বন্দ্ব	(সমান প্রাধান্য)
নেই	আছে	কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু	
আছে	নেই	অব্যয়ীভাব	
নেই	নেই	বহুব্রীহি	(ভিন্ন কোনোকিছুর প্রাধান্য)

নিচে বিভিন্ন প্রকার সমাসের বর্ণনা ও উদাহরণ উপস্থাপিত হলো।

দ্বন্দ্ব সমাস : এতে পূর্বপদ ও পরপদের সমান প্রাধান্য থাকে। ব্যাসবাক্যে সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার ঘটে থাকে। যেমন- মা ও বাপ = মা-বাপ। এখানে পূর্বপদ 'মা' ও পরপদ 'বাপ'। ব্যাসবাক্যে 'মা' ও 'বাপ' দুইজনকেই সমান প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, এবং দুজনকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পূর্বপদ ও পরপদ, উভয়েরই অর্থের প্রাধান্য রক্ষিত হয়েছে।

কর্মধারয় সমাস: কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। মূলত, এই সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদ পূর্বপদ ও বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদ পরপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর ব্যাসবাক্যটিতে ওই বিশেষ্য বা বিশেষ্য ভাবাপন্ন পদটি সম্পর্কে কিছু বলা হয়। অর্থাৎ পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। যেমন- নীল যে আকাশ = নীলাকাশ। এখানে, পূর্বপদ 'নীল' বিশেষণ ও পরপদ 'আকাশ' বিশেষ্য। ব্যাসবাক্যে 'আকাশ' সম্পর্কে বলা হয়েছে আকাশ 'নীল' রঙের। অর্থাৎ, 'আকাশ' বা পরপদের অর্থই এখানে প্রধান। কর্মধারয় সমাসের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম নিচে উল্লেখিত হলো:

দুইটি বিশেষণ একই বিশেষ্য বোঝালে সেটি কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন, যে চালাক সেই চতুর = চালাক-চতুর। এখানে পরবর্তী বিশেষ্যটি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে বলে এটি দ্বন্দ্ব সমাস হবে না।

দুইটি বিশেষ্য একই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালে সেটিও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: যিনি জজ তিনি সাহেব = জজসাহেব।

কার্যপরপম্পরা বোঝাতে দুটি কৃদন্ত বিশেষণ বা ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদেও কর্মধারয় সমাস হয়। যেমন: আগে ধোয়া পরে মোছা = ধোয়ামোছা। এখানে 'মোছা' কাজটি অধিকতর গুরুত্বপ্রাপ্ত।

পূর্বপদে নারীবাচক বিশেষণ থাকলে তা পুরুষবাচক হয়ে যাবে। যেমন : সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা

বিশেষণবাচক মহান বা মহৎ শব্দ পূর্বপদ হলে মহা হয়। যেমন: মহৎ যে জ্ঞান = মহাজ্ঞান

পূর্বপদে 'কু' বিশেষণ থাকলে এবং পরপদের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে 'কু', 'কৎ' হয়। যেমন : কু যে অর্থ = কদর্থ।

পরপদে 'রাজা' থাকলে 'রাজ' হয়। যেমন: মহান যে রাজা = মহারাজ।

বিশেষণ ও বিশেষ্য পদে কর্মধারয় সমাস হলে কখনো কখনো বিশেষ্য আগে এসে বিশেষণ পরে চলে যায়। যেমন: সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ।

কর্মধারয় সমাসকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদগুলো লোপ পায়। যেমন : 'স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ'। এখানে ব্যাসবাক্যের মধ্যবর্তী পদ 'রক্ষার্থে' লোপ পেয়েছে। উপমান এবং উপমিত কর্মধারয় সমাস নির্ধারণ করা হয় উপমান, উপমেয় ও সাধারণ ধর্মের তুলনামূলক বিশেষত্বের ওপর। উল্লেখ্য যে, যাকে তুলনা করা হয়, তাকে বলা হয় উপমেয়; আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তাকে বলে উপমান। অপরদিকে, উপমেয় এবং উপমানের যে গুণের ওপর ভিত্তি করে এই তুলনার কাজটি সম্পাদিত হয় তাকে বলা হয় সাধারণ ধর্ম। যেমন, তুষারধবল শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো তুষারের ন্যয় ধবল। এখানে 'তুষার' হলো উপমান এবং যার সঙ্গে তুষারের তুলনা করা হয়েছে তা হলো উপমেয়। আর উপমান এবং উপমেয়র মধ্যে সাদৃশ্য তৈরি করেছে 'ধবল' বিশেষণ, যা এই সমাসের সাধারণ ধর্ম। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, উপমান কর্মধারয় সমাসে সাধারণ ধর্মবাচক পদের সঙ্গে উপমান পদের সমাস হয়। অর্থাৎ, এই সমাসে সাধারণ ধর্মবাচক পদের উল্লেখ থাকবে। অপরদিকে, উপমিত কর্মধারয় সমাসে উপমেয় ও উপমান পদের মধ্যে সমাস হয়। এতে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকে না। যেমন: 'পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ'। এখানে উপমেয় 'পুরুষ'কে উপমান 'সিংহ'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু সিংহের কোন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পুরুষের সাদৃশ্য রয়েছে তা-র উল্লেখ থাকে না। অপরদিকে, রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমান ও উপমেয় পদের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় এবং ব্যাসবাক্যে 'রূপ' শব্দটি থাকে। যেমন: 'ভব রূপ নদী = ভবনদী'। এখানে 'ভব' উপমেয় ও 'নদী' উপমান। কিন্তু এখানে সাদৃশ্য নয়, অভেদ কল্পনাকে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ, এখানে ভব তথা পৃথিবীকেই নদীর সঙ্গে একীভূত রূপে বিবেচনা করা হয়েছে।

তৎপুরুষ সমাস : পূর্বপদের শেষের বিভক্তি লোপ পায় এই সমাসে এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়। পূর্বপদের যে বিভক্তি লোপ পায়, সেই বিভক্তি অনুযায়ী তৎপুরুষ সমাসের নামকরণ করা হয়। পূর্বপদে কোনো বিভক্তি লোপ না পেলে তাকে অলুক তৎপুরুষ সমাস বলা হয়। তবে, সাধারণত তৎপুরুষ সমাসে বিভক্তি লোপ পায়। যেমন, দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত। এখানে পূর্বপদ 'দুঃখ'-এর সঙ্গে থাকা দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়েছে। আবার পরপদ 'প্রাপ্ত'-এর অর্থই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বপদে বিভক্তি লোপ এবং পরপদের অর্থের প্রাধান্য তৎপুরুষ সমাসের বৈশিষ্ট্য।

বহুব্রীহি সমাস: পূর্বপদ বা পরপদের পরিবর্তে এই সমাসে ভিন্ন অনুল্লিখিত কোনো কিছুকে এই সমাসে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যেমন : 'গায়ে হলুদ' একটি বহুব্রীহি সমাস। এর ব্যাসবাক্য হলো : 'গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে'। লক্ষণীয় যে,

এতে কারও শরীরে হলুদ মাখানোকে বোঝানো হয়নি বরং এর বাইরে বিবাহের একটি অনুষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বহুব্রীহি সমাস হয়ে থাকে। এদের মধ্যে রয়েছে : সমানাধিকরণ বহুব্রীহি, ব্যধিকরণ বহুব্রীহি, ব্যাতিহার বহুব্রীহি প্রভৃতি।

দ্বিগু সমাস: এই সমাসেও পরপদের অর্থই প্রধান। এতে বিশেষণ পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হয়। তবে এখানে বিশেষণ পদটি সর্বদাই সংখ্যাবাচক হয়। যেমন : 'পঞ্চবটী'। এর ব্যাসবাক্য হলো : 'পঞ্চ বটের সমাহার'। এ ধরনের কাঠামোতেই অর্থাৎ পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদে 'সমাহার' শব্দবন্ধ রক্ষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এই সমাসের ব্যাসবাক্য গঠিত হয়। একই সঙ্গে এই সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান হিসেবে দেখা দেয়।

অব্যয়ীভাব সমাস : পূর্বপদে অব্যয় বাচক শব্দ এবং তার অর্থই প্রাধান্য পায় এই সমাসে। যেমন, 'মরণ পর্যন্ত = আমরণ'। এখানে পূর্বপদ হিসেবে পর্যন্ত অর্থে 'আ' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরপদ 'মরণ'। কিন্তু এখানে সমস্ত পদটিকে নতুন অর্থ দিয়েছে 'আ' উপসর্গটি। অর্থাৎ, এখানে 'আ' উপসর্গ বা অব্যয় বা পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পেয়েছে। তাই এটি অব্যয়ীভাব সমাস।

প্রাদি সমাস : প্র, প্রতি, অনু, পরি, ইত্যাদি অব্যয় বা উপসর্গের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সমাস হয়। যেমন : প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন = প্রবচন। এখানে 'বচন' সমস্যমান পদটি একটি বিশেষ্য, যার মূল বচ্ ধাতু। 'প্র' অব্যয়ের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় সাধিত বিশেষ্য 'বচন'-এর সমাস হয়ে সমস্ত পদ 'প্রবচন' শব্দটি তৈরি হয়েছে।

নিত্য সমাস : এই সমাসের সমস্তপদই ব্যাসবাক্যের কাজ করে। অর্থাৎ, এরা নিত্য সমাসবদ্ধ থাকে। যেমন : অন্যগ্রাম = গ্রামান্তর। এখানে 'অন্য গ্রাম' আর 'গ্রামান্তর', এই বাক্যাংশ ও শব্দটি উভয়েই প্রায় অভিন্ন। অর্থাৎ, সমস্তপদ এবং ব্যাসবাক্য প্রায় অভিন্ন। কেবল 'অন্য' শব্দের বদলে 'অন্তর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এটি নিত্য সমাস।

দ্বিরুক্তি ও পরিভাষিক শব্দ

দ্বিরুক্তি

বাংলা ভাষায় কখনও কখনও একই শব্দের একাধিকবার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অর্থের সংকোচন, প্রসারণ, পরিবর্তন ঘটে থাকে। এগুলোকে সাধারণভাবে 'দ্বিরুক্তি' (অর্থাৎ দুইবার উক্ত হয়েছে এমন) নামে আখ্যা দেওয়া হয়। বাংলা ভাষায় অনেক শব্দ কিংবা বাক্যে ব্যবহৃত পদ, এমনকি অনুকার ধ্বনিও একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ বাগর্থ তাৎপর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন- 'তুমি মাঝে মাঝে বেড়াতে এসো।' বাক্যটি যে বক্তব্য প্রকাশ করছে, যদি একবার 'মাঝে' ব্যবহৃত হতো তাহলে তা প্রকাশিত হতো না। দ্বিরুক্তি তিন প্রকারের : শব্দের দ্বিরুক্তি, পদের দ্বিরুক্তি ও অনুকার দ্বিরুক্তি।

শব্দের দ্বিরুক্তি: একই শব্দ অভিন্নভাবে পরপর দুইবার ব্যবহৃত হয়ে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠন করতে পারে। যেমন- ভাল ভাল বই, ফোঁটা ফোঁটা জল, বড় বড় বাড়ি, ইত্যাদি। ধ্বনিগত সাদৃশ্য ও সম্পর্ক আছে এমন শব্দ জোড় তৈরি করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন : কাপড়-চোপড়, লালন-পালন, খোঁজ-খবর প্রভৃতি। কখনও কখনও একই শব্দ অভিন্নভাবে দুইবার ব্যবহৃত না হয়ে এদের কোনো একটি সামান্য ধ্বনিগত পরিবর্তন সহযোগে উচ্চারিত হয়। যেমন : মিট-মাট, ফিট-ফাট, বকা-ঝকা, তোড়-জোড়, গল্প-সল্প, রকম-সকম প্রভৃতি। এছাড়া সমার্থক শব্দযোগে দ্বিরুক্তি হতে পারে। যেমন : ধন-দৌলত, বলা-কওয়া, টাকা-পয়সা। আবার বিপরীতার্থক শব্দযোগেও দ্বিরুক্তি ঘটতে পারে। যেমন- লেন-দেন, দেনা-পাওনা, ধনী-গরিব, আসা-যাওয়া প্রভৃতি।

পদের দ্বিরুক্তি : বাক্যস্থিত বিভিন্ন পদ কখনও কখনও দুইবার ব্যবহৃত হয়ে অর্থের পরিবর্ধন ঘটিয়ে থাকে। পদের দ্বিরুক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এতে বিভক্তি চিহ্ন থাকে এবং ওই বিভক্তি চিহ্নেরও দ্বিরুক্তি ঘটে। এক্ষেত্রে, একই পদ অভিন্নভাবে পরপর দুইবার ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : ঘরে ঘরে লেখাপড়া হচ্ছে। দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। মনে মনে আমিও এ কথাই ভাবছিলাম প্রভৃতি। দুটি পদ সম্পূর্ণ এক না থেকে কখনও দ্বিতীয় পদে সামান্য পরিবর্তন ঘটেও ব্যবহৃত হতে পারে, যদিও সেক্ষেত্রে বিভক্তি চিহ্ন অবশ্যই অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন : আমরা হাতে-নাতে চোরটাকে ধরেছি। এছাড়া, ধ্বনিগত সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ কিংবা সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দে একই বিভক্তি যুক্ত হয়ে এবং পরপর ব্যবহৃত হয়ে পদের দ্বিরুক্তি ঘটতে পারে। যেমন : আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। *দেশে বিদেশে* বইটি লিখেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী, আর পথে-প্রবাসে লিখেছেন মুহম্মদ এনামুল হক। পদগত দ্বিরুক্তির কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ :

আধিক্য বোঝাতে	: রাশি রাশি ধন, ধামা ধামা ধান, ভাল ভাল আম, ছোট ছোট ডাল।
সামান্য বোঝাতে	: আমার জ্বর জ্বর লাগছে, কবি কবি ভাব, উড়ু উড়ু ভাব।
পরস্পরতা বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে	: তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ।
ক্রিয়া বিশেষণ	: ধীরে ধীরে যায়, ফিরে ফিরে চায়।
অনুরূপ কিছু বোঝাতে	: তার সঙ্গী সাথি কেউ নেই।
আগ্রহ বোঝাতে	: ও দাদা দাদা বলে ডাকছে।
তীব্রতা বোঝাতে	: গরম গরম জিলাপি। নরম নরম হাত।
সর্বনামের বহুবচন বোঝাতে	: সে সে লোক কোথায় গেল? কে কে এল? কেউ কেউ বলে।
ক্রিয়ার বিশেষণাত্মক ব্যবহার	: রোগীর তো যায় যায় অবস্থা। তোমার নেই নেই ভাব আর গেল না।
স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে	: দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এল।
ক্রিয়া বিশেষণ	: দেখে দেখে যাও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে?
পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে	: ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেছি।

অনুকার দ্বিরুক্তি : কখনও কখনও আপাত অর্থপূর্ণ নয় কিন্তু কোনো বিশেষ কিছুর বৈশিষ্ট্য কিংবা আচরণকে ধ্বনিগত সাদৃশ্যে প্রকাশ করে– এমন অব্যয় শব্দও পরপর ব্যবহৃত হয়ে দ্বিরুক্তি সৃষ্টি করতে পারে। এরূপ অনুকার অব্যয়ের সাহায্যে সৃষ্ট কিছু দ্বিরুক্তির উদাহরণ নিম্নরূপ :

ভাবের গভীরতা বোঝাতে	: সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি এত খারাপ!
পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে	: বার বার সে কামান গর্জে উঠল।
অনুভূতি বা ভাব বোঝাতে	: ভয়ে গা ছম ছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
বিশেষণ বোঝাতে	: পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।
ধ্বনিব্যঞ্জনা	: ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।

আরও কিছু অনুকার দ্বিরুক্তির উদাহরণ নিচে সন্নিবেশিত হলো :

বজ্রের ধ্বনি	: কড় কড়
তুমুল বৃষ্টির শব্দ	: ঝম ঝম
স্রোতের ধ্বনি	: কল কল
বাতাসের শব্দ	: শন শন
নূপুরের আওয়াজ	: রুম ঝুম
সিংহের গর্জন	: গর গর
ঘোড়ার ডাক	: চিঁহি চিঁহি
কোকিলের ডাক	: কুহু কুহু
চুড়ির শব্দ	: টুং টাং

পারিভাষিক শব্দ

জ্ঞানচর্চার অংশ হিসেবে বিভিন্ন জ্ঞানশাখাভিত্তিক যোগাযোগের প্রয়োজনে এবং বাংলা ভাষায় সেই সংশ্লিষ্ট কোনো যথোপযুক্ত শব্দ না থাকায় কখনও কখনও নতুন শব্দ তৈরি করে নিতে হয়। অন্য ভাষার শব্দের বাগর্থ, প্রয়োগ ও গঠনগত সাদৃশ্যে সৃষ্ট এ সকল শব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলা হয়। এর কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো :

পারিভাষিক শব্দ	মূল বিদেশি শব্দ	পারিভাষিক শব্দ	মূল বিদেশি শব্দ
অম্লজান	Oxygen	সচিব	Secretary
উদ্‌যান	Hudrogen	স্নাতক	Graduate
নথি	File	স্নাতকোত্তর	Post Graduate
প্রশিক্ষণ	Training	সমাপ্তি	Final
ব্যবস্থাপক	Manager	সাময়িকী	Periodical

বেতার	Radio	সমীকরণ	Equation
মহাব্যবস্থাপক	General Manager	পাঠক্রম	Curriculum

পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি করার চেয়ে তার প্রচলন নিশ্চিত করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। কখনও কখনও দেখা যায় যে, অন্য ভাষা থেকে আগত শব্দের পরিভাষা তৈরির পরও ওই শব্দটিই কৃতঋণ হিসেবে বেশি প্রচলিত হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত পরিভাষাটিই ক্রমশ অপরিচিত হয়ে যায়। ওপরের উদাহরণে Oxygen-এর বাংলা পরিভাষা অম্লজান করা হলেও বর্তমানে অক্সিজেন হিসেবেই এটি বেশি পরিচিত। আবার কম্পিউটার, ল্যাপটপ প্রভৃতি শব্দের তো বাংলা পরিভাষা তৈরির কোনো উদ্যোগই গৃহীত হয়নি। সেলুলার ফোন বা মোবাইল ফোনের বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'মুঠোফোন' সৃষ্টির চেষ্টা গৃহীত হলেও তা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। তাই বলা যায় যে, পারিভাষিক শব্দ তৈরিতে ভাষীদের আগ্রহ এবং তাগিদ উভয়েরই বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

শব্দ প্রকরণ

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে প্রচলিত ব্যাকরণে পদ হিসেবে নির্দেশ করা হলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো একটি শব্দ তখনই পদ হয়ে উঠতে পারে যদি তা বাক্যে ব্যবহৃত হয় এবং এই সূত্রে বিভক্তি যুক্ত হয়। বাক্যে যখন শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন শব্দগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য প্রতিটি শব্দের সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত শব্দাংশ যুক্ত হয় যা বিভক্তি নামে পরিচিত। যেহেতু শূন্য বিভক্তি যোগের সুযোগ বিদ্যমান সেহেতু বলা যেতে পারে যে, বাক্যের সকল শব্দই বিভক্তিযুক্ত। কিন্তু শব্দ যখন বাক্যের কাঠামোর বাইরে স্বাধীনভাবে থাকে তখন তাকে পদ বলে অভিহিত করার কোনো সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, 'শিশুটি হাসে' বাক্যে 'শিশুটি' বিশেষ্য পদ কিন্তু বাক্যের কাঠামোর বাইরে 'শিশু' কেবল বিশেষ্য শব্দ। কখনও কখনও শব্দ ও পদের গঠন অভিন্ন হতে পারে; যেমন : 'ভালো' একটি বিশেষণ শব্দ, আবার 'সমাজে ভালো মানুষের একান্ত প্রয়োজন' বাক্যে 'ভালো' বিশেষণ পদ। এরা দেখতে অভিন্ন হলেও এদের ব্যাকরণিক অবস্থান এক নয়। এ কারণে শব্দ প্রকরণের অংশ হিসেবেই বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। এই সূত্রে বলা চলে যে, বাংলা ভাষায় পাঁচ শ্রেণির শব্দ রয়েছে। এগুলো হলো : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম অব্যয় ও ক্রিয়া।

বিশেষ্য : কোনো কিছুর নামকেই বিশেষ্য বলে। কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, সমষ্টি, স্থান, কাল, ভাব, কর্ম, গুণ প্রভৃতির নাম প্রকাশক শব্দই হলো বিশেষ্য। বিশেষ্য ছয় প্রকার। নিচে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ্যের উদাহরণ দেওয়া হলো :

নামবাচক বিশেষ্য

(ক) ব্যাক্তির নাম : নজরুল, ওমর, আনিস, মাইকেল
(খ) ভৌগোলিক স্থানের নাম : ঢাকা, দিল্লি, লন্ডন, মক্কা
(গ) ভৌগোলিক নাম (নদী, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদির নাম) : মেঘনা, হিমালয়, আরব সাগর
(ঘ) গ্রন্থের নাম : গীতাঞ্জলি, অগ্নিবীণা, দেশে বিদেশে, বিশ্বনবী

জাতিবাচক বিশেষ্য

(এক জাতীয় প্রাণী বা পদার্থের নাম) মানুষ, গরু, গাছ, পাখি, পর্বত, নদী, ইংরেজ

বস্তুবাচক বা দ্রব্যবাচক বিশেষ্য

বই, খাতা, কলম, থালা, বাটি, মাটি, চাল, চিনি, লবণ, পানি

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টি)

সভা, জনতা, পঞ্চায়েত, মাহফিল, ঝাঁক, বহর, দল

ভাববাচক বিশেষ্য

(ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব বা কাজের নাম বোঝায়) গমন, শয়ন, দর্শন, ভোজন. দেখা, শোনা, যাওয়া, শোয়া

গুণবাচক বিশেষ্য

মধুরতা, তারল্য, তিক্ততা, তারুণ্য, সৌরভ, স্বাস্থ্য, যৌবন, সুখ, দুঃখ

বিশেষণ :বিভিন্ন প্রকার শব্দের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি প্রকাশ করে বিশেষণ। বিশেষণের মূল কাজ হলো বিশেষিত করা। বিশেষণ প্রধানত দুই প্রকার : নাম বিশেষণ ও ভাব বিশেষণ। নাম বিশেষণ কোনো বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দকে এবং বাক্য-অন্তর্গত পদকে বিশেষিত করে; পক্ষান্তরে, ভাব বিশেষণ বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দ ছাড়া অন্য যে কোনো শব্দকে এবং বাক্য-অন্তর্গত পদকে বিশেষিত করে। নিচে বিভিন্ন ধরনের বিশেষণের উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

বিশেষ্যের বিশেষণ : নীল আকাশ আর সবুজ মাঠের মাঝ দিয়ে একটি ছোট্ট পাখি উড়ে যাচ্ছে।

সর্বনামের বিশেষণ : সে রূপবান ও গুণবান।

ক্রিয়া বিশেষণ : ধীরে ধীরে বায়ু বয়। পরে একবার এসো।

বিশেষণের বিশেষণ (কোনো বিশেষণ যদি অন্য একটি বিশেষণকেও বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে।) : ও অতি ভালো ছেলে। গাঢ়/টকটকে লাল গোলাপ।

নাম বিশেষণের বিশেষণ : সামান্য একটু দুধ দাও। এ ব্যাপারে সে অতিশয় দুঃখিত।

ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ : রকেটি অতি দ্রুত চলে।

অব্যয়ের বিশেষণ (অব্যয়ের অর্থকে বিশেষিত করে) : ধিক তারে, শত ধিক নির্লজ্জ যে জন।

বাক্যের বিশেষণ (সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করে) : দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ আবার নানা সমস্যাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

বিশেষণের অতিশায়ন (degree): দুই বা ততোধিক বিশেষ্য বা সর্বনামের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের অতিশায়ন ঘটে। বিভিন্নভাবে এই অতিশায়নরে বিষয়টি সম্পাদিত হয়। নিচে তা নির্দেশ করা হলো :

দুয়ের মধ্যে অতিশায়ন বোঝাতে দুইটি বিশেষ্য বা সর্বনামের মধ্যে হতে, থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা, ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম বিশেষ্যটির সঙ্গে ষষ্ঠী বিভক্তি (র, এর) যুক্ত হয়। যেমন : গরুর থেকে ঘোড়ার দাম বেশি; বাঘের চেয়ে সিংহ বলবান, প্রভৃতি। তবে, কখনও কখনও প্রথম বিশেষ্যের শেষের ষষ্ঠী বিভক্তিই হতে, থেকে, চেয়ে-র কাজ করে। যেমন : এ মাটি সোনার বাড়া (সোনার চেয়েও বাড়া)। দুয়ের মধ্যে অতিশায়নে জোর প্রদানের জন্য মূল বিশেষণের পূর্বে 'অনেক', 'অধিক', 'বেশি', 'অল্প', 'কম', 'অধিকতর'প্রভৃতি শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন : পদ্মফুল গোলাপের চেয়ে বেশি সুন্দর; ঘিয়ের চেয়ে দুধ বেশি উপকারী প্রভৃতি।

বহুর মধ্যে অতিশায়নে বিশেষণের পূর্বে সবচাইতে, সর্বাপেক্ষা, সবথেকে, সবচেয়ে,সর্বাধিক, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন:

তোমাদের মধ্যে করিম সবচেয়ে বুদ্ধিমান; পশুর মধ্যে সিংহ সর্বাপেক্ষা বলবান, প্রভৃতি।

সংস্কৃত থেকে আগত বিশেষণের অতিশায়নের ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'তর' এবং বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'তম' যোগ হয়। যেমন : গুরু- গুরুতর- গুরুতম; দীর্ঘ- দীর্ঘতর- দীর্ঘতম প্রভৃতি। কখনও আবার দুয়ের মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'ঈয়স' প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং বহুর মধ্যে তুলনা বোঝালে বিশেষণের শেষে 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন : লঘু- লঘীয়ান- লঘিষ্ঠ; অল্প- কনীয়ান- কনিষ্ঠ; বৃদ্ধ- জ্যায়ান- জ্যেষ্ঠ; শ্রেয়- শ্রেয়ান- শ্রেষ্ঠ। উল্লেখ্য যে, দুয়ের তুলনায় এই নিয়মের ব্যবহার বাংলায় হয় না।

সর্বনাম : বিশেষ্য শব্দের পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাই হলো সর্বনাম। বিভিন্ন ধরনের সর্বনাম রয়েছে। এগুলো হলো :

ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক	: আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা
আত্মবাচক	: স্বয়ং, নিজ, খোদ, আপনি
সামীপ্যবাচক	: এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি
দূরত্ববাচক	: ঐ, ঐসব, সব
সাকল্যবাচক	: সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ
প্রশ্নবাচক	: কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কীসে
অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক	: কোন, কেহ, কেউ, কিছু
ব্যতিহারিক	: আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর
সংযোগজ্ঞাপক	: যে, যিনি, যাঁরা, যাহারা
অন্যাদিবাচক	: অন্য, অপর, পর

সাপেক্ষবাচক : যত-তত, যেই-সেই, যেমন-তেমন

অব্যয় : কোনো প্রকার ব্যাকরণিক প্রক্রিয়ায় এসব শব্দের কোনো পরিবর্তন ঘটে না বলে এদের অব্যয় বলা হয়। বাক্যে ব্যবহৃত হলেও, অব্যয় পদের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এরা বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে কখনো বাক্যকে আরও শ্রুতিমধুর করে; কখনো-বা একাধিক পদ বা বাক্যাংশ বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধরনের অব্যয় রয়েছে। এগুলো হলো :

সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে অব্যয় পদ একাধিক পদের বা বাক্যাংশের বা বাক্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তাকে সমুচ্চয়ী অব্যয় বলে। এই সম্পর্ক সংযোজন, বিয়োজন বা সংকোচন যে কোনটিই হতে পারে। একে সম্বন্ধবাচক অব্যয়ও বলে।

সংযোজক অব্যয় : ও, আর, তাই, অধিকন্তু, সুতরাং, ইত্যাদি। উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। (উচ্চপদ, সামাজিক মর্যাদা- দুটোই চায়); তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। (তাই অব্যয়টি 'তিনি সৎ' ও 'সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে' বাক্য দুটির মধ্যে সংযোগ ঘটিয়েছে।

বিয়োজক অব্যয় : কিংবা, বা, অথবা, নতুবা, না হয়, নয়তো, ইত্যাদি। আবুল কিংবা আব্দুল এই কাজ করেছে। (আবুল, আব্দুল- এদের একজন করেছে, আরেকজন করেনি। সম্পর্কটি বিয়োগাত্মক, একজন করলে অন্যজন করেনি।) মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ('মন্ত্রের সাধন' আর 'শরীর পাতন' বাক্যাংশ দুটির একটি সত্য হবে, অন্যটি মিথ্যা হবে।)

সংকোচক অব্যয় : কিন্তু, বরং, তথাপি, যদ্যপি, ইত্যাদি। তিনি শিক্ষিত, কিন্তু অসৎ। (এখানে 'শিক্ষিত' ও 'অসৎ' দুটোই সত্য, কিন্তু শব্দগুলোর মধ্যে সংযোগ ঘটেনি। কারণ, বৈশিষ্ট্য দুটো একরকম নয়, বরং বিপরীতধর্মী। ফলে তিনি অসৎবলে তিনি শিক্ষিত বাক্যাংশটির ভাবের সংকোচ ঘটেছে।)

অনন্বয়ী অব্যয় : এগুলো নানা ভাব বা অনুভূতি প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। এরা বাক্যের অন্য কোনো পদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

উচ্ছ্বাস প্রকাশে	: মরি মরি! কী সুন্দর সকাল!
স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি প্রকাশে	: হ্যা, আমি যাব। না, তুমি যাবে না।
সম্মতি প্রকাশে	: আমি আজ নিশ্চয়ই যাব।
অনুমোদন প্রকাশে	: এতো করে যখন বললে, বেশ তো আমি আসবো।
সমর্থন প্রকাশে	: আপনি তো ঠিকই বলছেন।
যন্ত্রণা প্রকাশে	: উঃ! বড্ড লেগেছে।
ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশে	: ছি ছি, তুমি এতো খারাপ!
সম্বোধন প্রকাশে	: ওগো, তোরা আজ যাসনে ঘরের বাহিরে।
সম্ভাবনা প্রকাশে	: সংশয়ে সংকল্প সদা টলে/ পাছে লোকে কিছু বলে।
বাক্যালংকার হিসেবে	: কত না হারানো স্মৃতি জাগে আজ মনে।

অনুসর্গ অব্যয় : বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের কারকবাচকতা প্রকাশ করার কাজ করে অনুসর্গ অব্যয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। (এখানে 'দিয়ে' তৃতীয়া বিভক্তির মতো কাজ করেছে, এবং 'ওকে' যে কর্ম কারক, তা নির্দেশ করেছে। এই 'দিয়ে' হলো অনুসর্গ অব্যয়)।

ক্রিয়া:

ভাষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ক্রিয়া। এটি কোনো কাজ করা বোঝায়। বাংলা ভাষায় ক্রিয়ামূল বা ধাতুর সঙ্গে পুরুষ ও কাল অনুযায়ী ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে বাক্যে ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটায়। ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি বাক্যে অপরিহার্য। বিভিন্নভাবে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ সম্ভব। নিচে এগুলো আলোচিত হলো :

সমাপিকা-অসমাপিকা ক্রিয়া : সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের বক্তব্যের পরিসমাপ্তি ঘটায়। একটি বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকতেই হয়। অপরদিকে, অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যে বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটায় না। প্রসঙ্গত দুটি উদাহরণ লক্ষণীয় : ছেলেরা খেলছে। মেয়েরা খেলে বাড়িতে ফিরল। প্রথম বাক্যে 'খেলছে' এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'ফিরল' সমাপিকা ক্রিয়া। অপরদিকে, দ্বিতীয় বাক্যে 'খেলে' ক্রিয়াটি ভাবের বা বক্তব্যের সমাপ্তি ঘটাচ্ছে না বলে তা অসমাপিকা ক্রিয়া। একটি বাক্যে যতোগুলো প্রয়োজন অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করা যায়। সাধারণত অসমাপিকা ক্রিয়ার শেষে ইয়া, ইলে, ইতে, এ, লে, তে বিভক্তিগুলো যুক্ত থাকে।

সকর্মক-অকর্মক-দ্বিকর্মক ক্রিয়া : বাক্যে ব্যবহৃত কর্মপদের ওপর নির্ভর করে ক্রিয়াকে অকর্মক, সকর্মক ও দ্বিকর্মক– এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাক্যে যে সকল পদকে আশ্রয় করে ক্রিয়া তার কাজ সম্পাদন বা সংঘটন করে, তাকে বা তাদের কর্মপদ বলে।

ক্রিয়াপদকে 'কী/ কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, সেটিই কর্মপদ। যেমন- মেয়েটি তার বন্ধুকে কলমটি দিল। এই বাক্যে 'কে', 'কী' এবং 'কাকে' এই তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া সম্ভব। উল্লেখ্য যে, 'কে' প্রশ্ন দিয়ে বাক্যের কর্তাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সাধারণত বাক্যে কর্তা উহ্য বা প্রত্যক্ষ হিসেবে থাকে। এর বাইরে এই বাক্যে 'কী' এবং 'কাকে'-র উত্তর মেলে; অর্থাৎ এই বাক্যে দুটি কর্ম রয়েছে। তাই একে বলা হয় দ্বিকর্মক ক্রিয়া। আবার, 'মেয়েটি ছবি আঁকে' বাক্যে একটি কর্ম রয়েছে। তাই এটি সকর্মক ক্রিয়ার বাক্যের উদাহরণ। অপরদিকে, বাক্যে যদি কেবল কর্তা ও ক্রিয়া থাকে কিন্তু কোনো কর্ম না থাকে তবে সেই ক্রিয়াকে অকর্মক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন : মেয়েটি হাসে।

প্রযোজক ক্রিয়া: এই ক্রিয়া একজনের প্রযোজনায় আরেকজনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রযোজক ক্রিয়ার দুজন কর্তা থাকে। এরমধ্যে একজন কর্তা কাজটি আরেকজন কর্তাকে দিয়ে করান। প্রযোজক ক্রিয়ার দুইজন কর্তার মধ্যে যিনি কাজটি করান, তাকে বলে প্রযোজক কর্তা। আর যিনি কাজটি করেন, তাকে বলে প্রযোজ্য কর্তা। যেমন- শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখাচ্ছেন। এখানে 'ব্যাকরণ শেখার' কাজটি করছে 'ছাত্রেরা', কিন্তু শেখাচ্ছেন 'শিক্ষক'। অর্থাৎ, 'শিক্ষক' কাজটি প্রযোজনা করছেন। তাই 'শিক্ষক' এখানে প্রযোজক কর্তা। আর 'ব্যাকরণ শেখার' কাজটি আসলে 'ছাত্ররা' করছে, তাই 'ছাত্রেরা' এখানে প্রযোজ্য কর্তা।

নামধাতুর ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে সব ধাতু গঠিত হয়, তাদেরকে নামধাতু বলে। নামধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে নামধাতুর ক্রিয়ার গঠিত হয়। যেমন : বিশেষ্য বেত+আ = বেতা, ক্রিয়া = বেতানো, বেতাচ্ছেন; বিশেষণ = বাঁকা+আ = বাঁকা, ক্রিয়াপদ = বাঁকানো, বাঁকাচ্ছেন প্রভৃতি।

যৌগিক ক্রিয়া: একটি সমাপিকা ক্রিয়া ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া পাশাপাশি বসে যদি কোনো বিশেষ বা সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। সাধারণত যৌগিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে, একাধিক ক্রিয়া যুক্ত হয়ে তাদের সাধারণ অর্থ প্রকাশ না করে কোনো বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। কয়েকটি উদাহরণ দ্রষ্টব্য :

ঘটনাটা শুনে রাখ। (শোনার বদলে তাগিদ দেয়া অর্থ বুঝিয়েছে)
তিনি বলতে লাগলেন। (ক্রিয়ার ঘটমানতা বোঝাচ্ছে)
ছেলেমেয়েরা শুয়ে পড়ল। (শোওয়ার পাশাপাশি কার্যসমাপ্তিও বোঝাচ্ছে)
সাইরেন বেজে উঠল। (আকস্মিকতা বোঝাতে)
শিক্ষায় মন সংস্কারমুক্ত হয়ে থাকে। (অভ্যস্ততা অর্থে)
এখন যেতে পার। (যাওয়ার অনুমোদন অর্থে)

মিশ্র ক্রিয়া : বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, হ্, দে, পা, যা, কাট্, গা, ছাড়্, ধর্ মার্ প্রভৃতি ধাতু যোগ হয়ে মিশ্র ক্রিয়া গঠিত হয়। উদাহরণ : মানা কর্, ভাত দে ইত্যাদি।

ব্যাকরণিক উপাদান

পুরুষ

উত্তম পুরুষ : বাক্যের বক্তার ভূমিকা যে পালন করে তাকেই উত্তম পুরুষ হিসেবে নির্দেশ করা হয়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বাক্য উচ্চারণ করছে, সেই উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো : আমি, আমরা, আমাকে, আমাদের, ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ : যাকে উদ্দেশ করে বক্তা বাক্য উচ্চারণ করে তাকে মধ্যম পুরুষ বলে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষভাবে উদ্দিষ্ট শ্রোতাই মধ্যম পুরুষ। মধ্যম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদের, তোমাদিগকে, আপনি, আপনার, আপনাদের ইত্যাদি।

নামপুরুষ : বাক্যে অনুপস্থিত যেসব ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর উল্লেখ বক্তা করেন, তাদের নামপুরুষ বলে। অর্থাৎ, বক্তার সামনে নেই এমন যা কিছুর কথা বক্তা বাক্যে বলেন, সবগুলোই নামপুরুষ। নাম পুরুষের সর্বনামের রূপ হলো- সে, তারা, তাহারা, তাদের, তাহাকে, তিনি, তাঁকে, তাঁরা, তাঁদের, ইত্যাদি।

বচন

বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দের সংখ্যাবাচকতা বোঝাতে বচন ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার : একবচন ও বহুবচন। একজন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বোঝাতে সংখ্যাবাচক শব্দের এক বচনের রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন : ছেলেটা, একটি মেয়ে, প্রভৃতি। অপরদিকে, বহুবচন নির্দেশক শব্দ দ্বারা একের বেশি ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বোঝান হয়। যেমন : ছেলেগুলো, কয়েকটি কলম, সারি সারি গাছ প্রভৃতি। বাংলা ভাষায় কেবল বিশেষ্য ও সর্বনামের বচনভেদ হয়। কখনোই বিশেষণের বচনভেদ হয় না। কেবল উন্নত প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে, অর্থাৎ মানুষ বা মনুষ্যবাচক শব্দের সঙ্গে 'রা/এরা' ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে, বস্তু ও প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গে 'গুলা/গুলি/গুলো' যুক্ত হয়।

বহুবচন বাচক শব্দের ব্যবহার

গণ- দেবগণ, নরগণ, জনগণ
বৃন্দ- সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ,
মণ্ডলী- শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী
বর্গ- পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ
কুল- পক্ষিকুল, বৃক্ষকুল
সকল- পর্বতসকল, মনুষ্যসকল
সব- ভাইসব, পাখিসব
সমূহ- বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ
পাল- গরুর পাল
যূথ- হস্তিযূথ
আবলি- পুস্তকাবলি
গুচ্ছ- কবিতাগুচ্ছ
দাম- কুসুমদাম
নিকর- কমলনিকর
পুঞ্জ- মেঘপুঞ্জ
মালা- পর্বতমালা
রাজি- তারকারাজি
রাশি- বালিরাশি
নিচয়- কুসুমনিচয়

কখনও কখনও একবচন নির্দেশক বিশেষ্য ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন : সিংহ বনে থাকে (সব সিংহ বনে থাকে বোঝাচ্ছে)। পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়। বাজারে লোক জমেছে।

একবচন নির্দেশক বিশেষ্যের আগে বহুত্ব জ্ঞাপক শব্দ, যেমন : অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন : অজস্র লোক, অনেক ছাত্র, বিস্তর টাকা প্রভৃতি। বিশেষ্য পদ বা তার সম্পর্কে বর্ণনাকারী বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে, অর্থাৎ পদটি পরপর দুইবার ব্যবহার করেও বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। যেমন হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত, লাল লাল ফুল, বড় বড় মাঠ প্রভৃতি। এছাড়াও বিশেষ কিছু নিয়মে বাংলা ভাষায় বহুবচন নির্দেশ করা হয়। যেমন : এটাই করিমদের বাড়ি ('করিমদের' বলতে এখানে করিমের পরিবারকে বোঝানো হচ্ছে)। রবীন্দ্রনাথরা প্রতিদিন জন্মান না ('রবীন্দ্রনাথরা' বলতে রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্যিকদের বোঝানো হচ্ছে)। উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় একই সঙ্গে একাধিক/ একটির বেশি বহুবচন নির্দেশক শব্দ ও শব্দাংশ ব্যবহার করা যায় না। যেমন : 'সকল ছেলেরা' বললে তা ভুল হবে। বলতে হবে 'সকল ছেলে' বা 'ছেলেরা'।

নারী ও পুরুষবাচক শব্দ

বিশ্বের অনেক ভাষার মতোই বাংলা ভাষাতেও নারী ও পুরুষ ভেদে শব্দের রূপ পরিবর্তিত হয়। তবে, বাংলা ভাষায় নারী-পুরুষের এই ভেদ ব্যাকরণিক নয়। অর্থাৎ, আরবি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার মতো জড়বস্তু কিংবা বিশেষণে নারী কিংবা পুরুষবাচক চিহ্ন যুক্ত হয় না। বাংলা ভাষায় নারীবাচক শব্দ যেমন রয়েছে তেমনি পুরুষবাচক শব্দ রয়েছে। পুরুষবাচক

শব্দের কয়েকটি উদাহরণ হলো : বাপ, ভাই, ছেলে প্রভৃতি। নারীবাচক কয়েকটি শব্দ হলো : মা, বোন, মেয়ে প্রভৃতি। নারী প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠনের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

ঈ-প্রত্যয় : নিশাচর-নিশাচরী, ভয়ংকর-ভয়ংকরী, রজক-রজকী, কিশোর-কিশোরী, বেঙ্গম-বেঙ্গমী, ভাগনা/ভাগনে- ভাগনী

নী-প্রত্যয় : কামার-কামারনি, জেলে-জেলেনি, কুমার-কুমারনি, ধোপা-ধোপানি, মজুর-মজুরনি পুরুবাচক শব্দের শেষে 'ঈ' থাকলে নী-প্রত্যয় যোগ হলে আগের 'ঈ', 'ই' হয়। যেমন: ভিখারী- ভিখারিনী

আনী-প্রত্যয় : আচার্য-আচার্যানী

ইনি-প্রত্যয় : কাঙাল-কাঙালিনি, গোয়ালা- গোয়ালিনি, বাঘ-বাঘিনি

উন-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকরুন

আইন-প্রত্যয় : ঠাকুর-ঠাকুরাইন

আ-প্রত্যয় : মৃত-মৃতা, বিবাহিত-বিবাহিতা, মাননীয়-মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, চতুর-চতুরা, চপল-চপলা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা, মলিন-মলিনা, অজ-অজা, শিষ্য-শিষ্যা, ক্ষত্রিয়-ক্ষত্রিয়া

ইকা-প্রত্যয় : শব্দের শেষে অক থাকলে ইকা-প্রত্যয় যোগ হয় এবং অক'-এর স্থলে ইকা হয়। যেমন : বালক-বালিকা, নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকা, সেবক-সেবিকা।

পুরুবাচক শব্দ গঠনের জন্য কতগুলো শব্দের আগে নর, মদ্দা প্রভৃতি ও নারীবাচক শব্দ গঠনের জন্য স্ত্রী, মাদি, মাদা, ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। যেমন: মর/ মদ্দা/ হুলো বিড়াল- মেনি বিড়াল, পুরুষলোক-মেয়েলোক, বেটাছেলে- মেয়েছেলে, পুরুষ কয়েদি- নারী কয়েদি, বলদ গরু- গাই গরু প্রভৃতি।

শব্দের শেষে পুরুষ বা নারীবাচক শব্দ যোগ করেও এ ধরনের শব্দ তৈরি করা যায়। যেমন : বোন-পো- বোন-ঝি, ঠাকুর-পো- ঠাকুর-ঝি, গয়লা- গয়লা-বউ, জেলে- জেলে-বউ। যে সব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' আছে, সেগুলোর শেষে 'ত্রী' হয়। যেমন- নেতা-নেত্রী, কর্তা-কর্ত্রী প্রভৃতি। পুরুষবাচক শব্দের শেষে অত, বান, মান, ঈয়ান থাকলে নারীবাচক শব্দে যথাক্রমে অতী, বতী, মতী, ঈয়সী হয়। যেমন : সৎ-সতী, গুণবান-গুণবতী, বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী, গরীয়ান-গরিয়সী। এছাড়া, বিশেষ নিয়মে গঠিত নারীবাচক শব্দ : সম্রাট- সম্রাজ্ঞী, যুবক-যুবতি, শ্বশুর-শ্বশ্রূ, বন্ধু-বান্ধবী, দেবর- জা, শিক্ষক- শিক্ষয়িত্রী, পতি-পত্নী, সভাপতি-সভানেত্রী প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

২. শব্দ বলতে কী বোঝেন? উৎস অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

৩. গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

৪. বাগর্থ অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।

৫. শব্দের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করুন।